আমাদের দারিদ্র্যের স্বরূপ

পিআরএসপি বিশেষ ক্রোড়পত্র

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : **আসজাদুল কিবরিয়া**
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **মনজুর আহমেদ**
সহযোগিতা : **ফারজানা নাজ**
গ্রাফিক্স ও মেকআপ : **হাবিবুর রহমান**

১. আলী হোসেনের বয়স ৫০। ১৭/১৮ বছর আগে সে ভ্যানগাড়ি চালাত। কিন্তু ঠিকমতো খেতে না পেরে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে যায়। অসুখে ভুগে সেরে ওঠার পর ভ্যানগাড়ি টানার সেই শক্তি ফিরে পায়নি। তাই এখন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঝাড়া-মোছা, ঘর ধোয়া ও জিনিসপত্র টানার কাজ করে। তবে শরীরে পর্যাপ্ত শক্তি নেই বলে ভারী মালপত্র টানতে পারে না। বেতন-ভাতা সব মিলিয়ে মাসে পায় ১৫০০ টাকা। তার বউও বাইরে কাজ করে। দু'জনে মিলে যা পায় তাতে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে চলে না। ১ মেয়ের বিয়ে দিলেও যৌতুক দিতে না পারায় অত্যাচার করে স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্য আর অপুষ্টি আলী হোসেনকে আরো দরিদ্র ও রুগ্ন করে দিচ্ছে।

২. পারভীন একটি গার্মেন্টসে কাজ করে। সকাল ৮টায় যায়, রাত ৮টায় ফেরে। কখনো কখনো কাজের চাপ বেশি হলে নাইট করতে হয়। ঘরে ফেরে রাত ১টা, ২টায়। তার পরদিন আবার সকালে ছুটতে হয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও সবসময় ছুটি মেলে না। এতো খাটুনির পরও মাস শেষে ঠিকমতো বেতন মেলে না প্রায়ই। ৩/৪ মাসের বেতন বকেয়া থাকে। ঘন্টায় ৩ টাকা হিসেবে ওভার টাইম। আর মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা। গ্রামে মা ও বোনকে টাকা পাঠাতে হয়। ঠিকমতো খাওয়া হয় না। শোষণ আর অপুষ্টির শিকার পারভীন ক্রমেই বেশি করে শোষিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার ৩০ বছর পেরিয়ে আসার পরও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের স্বরূপটি কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরটি জানার জন্য উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্তই নমুনা হিসেবে যথেষ্ট। তবে এর বিস্তারিত জানা প্রয়োজন এজন্যই যে, আমরা একটি দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছি। আর অদূর ভবিষ্যতে এই পিআরএসপিই হবে বাংলাদেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উৎস দলিল। বিদেশী সাহায্য, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই দলিলের ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করবে। গরিবী কমানোর কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গরিবী বা দারিদ্র্যের বিস্তারটি আমাদের দেশে প্রবল। সে কারণেই আমরা এখনও স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি, পারা সম্ভবও নয় দ্রুত যদি না দারিদ্র্য কমানো যায়।

আমাদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি বুঝতে হলে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সদ্য প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০২-এর দিকে তাকাতে হবে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতা ফোরাম সার্কের ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। মানব দারিদ্র্য সূচকেও ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। মাথাপিছু জিএনপি ৭৫৫ ডলার বা তার কম এমন ৫৩টি নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশের সারিতে বাংলাদেশের অবস্থান। বস্তুত, মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকাই বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকটতা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। কারণ বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৫৮.১ বছর, শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১ হাজারে ৫৪ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৮২ জন। অবশ্য ১৯৭০ সালে শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১ হাজারে ১৪৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২৩৯ জন ছিল। মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি ১ লাখে ৩৫০ জন।

দারিদ্র্যের রূপটি আরো প্রকট হয় এভাবে– বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু আয় মাত্র ২ ডলার এমন লোক রয়েছে মোট জনগোষ্ঠীর ৭৭.৮%। ২ ডলার মানে প্রায় ১১৫ টাকা হিসাব করে মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। দেশের বিপুল সংখ্যক লোক এরকম আয় নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আর মাথাপিছু আয় দৈনিক ১ ডলার এমন লোক মোট জনগোষ্ঠীর ২৯.১%। অবশ্য জাতীয় দারিদ্র্যসীমা ৩৫.৬%। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫৩% পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে। প্রতি ১ লাখ লোকের জন্য চিকিৎসক রয়েছে ২০ জন। এসব চিকিৎসকের আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সময়মতো পাওয়া যায় না। সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে জিডিপির মাত্র ১.৭% ব্যয় করে। স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের মাথাপিছু গড় ব্যয় ১২ ডলার। ভয়াবহ দিক হলো জন্মের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর পরিচর্যা পায় এমন শিশু মাত্র ১২%।

অর্থনৈতিক বৈষম্য মানব বঞ্চনাকে প্রবল করেছে। দেশের মোট আয়ের মাত্র

'৯০-র দশকে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রবণতা

	১৯৯১-৯২	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন
মাথাপিছু হার			
জাতীয়	৫৮.৮	৪৯.৮	-১.৮%
নগর	৪৪.৯	৩৬.৬	-২.২%
পল্লী	৬১.২	৫৩.০	-১.৬%
দারিদ্র্য ব্যবধান			
জাতীয়	১৭.২	১২.৯	-২.৯%
নগর	১২.০	৯.৫	-২.৫%
পল্লী	১৮.১	১৩.৮	-২.৮%

সূত্র : খসড়া এনএসইজিপিআর, এপ্রিল ২০০২

৩.৯% পায় সবচে' গরিব ১০% লোক। বিপরীতে সবচে ধনী ১০% লোক নিয়ে যায় মোট আয়ের ২৮.৬%। অবশ্য সবচে' ধনী ২০% লোক মোট আয়ের ৪৪.৮% ভোগ করছে যেখানে সবচে' গরিব ২০% লোক পাচ্ছে মাত্র ৮.৭%। দাতাগোষ্ঠী অবশ্য আমাদের বাহবা দিয়ে বলছে যে দারিদ্র্য অনেকটা কমেছে। '৯০-র দশক জুড়ে দারিদ্র্য কমার পরিসংখ্যানও পাই আমরা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। বিশেষ করে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য যে প্রকট আকার ধারণ করেছে সেটি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বাড়ানো হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের অদক্ষতা বাড়াচ্ছে অপচয় ও অপব্যয়। বিদ্যুৎ খাতের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবসার পরও বিপিডিবি (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড) প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ লোকসান গুনছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বিপিডিবির লোকসান ছিল ৫১৮ কোটি টাকা। অথচ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ২০%-এরও কম বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পায়। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে মাথাপিছু ১১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে। সহজভাবে এটাই বলা যায় যে, দেশে বিদ্যুতের একটা বিশাল বাজার রয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত ৮০% লোকের মধ্যে ৩০%ও যদি ন্যূনতম বিদ্যুৎ ব্যয় মেটানোর ক্ষমতা রাখে, তাহলে এদের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছে দিতে সরকারের একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ ও ব্যয় করতে হবে। তবে বাজার সূত্র অনুযায়ী অবশ্যই এর একটা ভালো রিটার্ন বা লাভ আসবে। কারণ, জনগণ অর্থ খরচ করেই বিদ্যুৎ কেনে। সরকার দয়া করে দেয় না। অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাবই এমন যে, তারা দয়া করে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিচ্ছে। অদক্ষতার মাধ্যমে কার্যত বছরে ১০ কোটি ডলারের বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎখাতে লোকসান বাড়ছে। লোকসান এড়াতে বিশ্বব্যাংক পরামর্শ দিচ্ছে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর জন্য, গ্যাসের দাম বাড়ানোর জন্য। আর এই দাম বাড়াটা গিয়ে পড়ছে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের ওপর। ফলে তার প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিশ্লেষণ করতে গেলে এর দিকগুলো উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

বাজেট এলেই করের বিষয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। সত্যি বটে, রাজস্ব আয় বাড়ানো ও নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু এখানেও রয়েছে অদক্ষতা ও দুর্নীতি। ফলে উচ্চহারে যারা করদানে সক্ষম, তাদের কাছ থেকে ঠিকমতো কর আদায় হচ্ছে না। বরং পরোক্ষ করের বোঝা গিয়ে চেপে বসছে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের ওপর। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় অদক্ষতা ও দুর্নীতির কাফ্ফরা কেন সাধারণ জনগণ দেবে? কর নিয়েও বৈষম্য বাড়ছে। রাজধানী ঢাকায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলো কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এদের ওপর কর আরোপ করলে সমাজের উচ্চবিত্ত অংশ হৈ হৈ করে ওঠে। কোনোরকম বাছবিচার না করে মিডিয়াও মেতে ওঠে শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করা হচ্ছে বলে। এভাবেই বৈষম্য বাড়ানো হয়। বৈষম্য বাড়ানো হয় শিক্ষা সুবিধায়, সংস্কৃতিতে, চিন্তা-ভাবনায়। অথচ এসব স্কুলেরই তো সবচে' বেশি ট্যাক্স দেয়ার কথা।

বস্তুত দারিদ্র্য বিমোচনে, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, কোনো আগ্রহ নেই। নেই সরকারেরও। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের যখন কোনো উদ্যোগ নেই, তখন দাতা নির্দেশিত কৌশলপত্র দিয়ে কতোদূর অগ্রসর হওয়া যাবে সেটাই প্রশ্ন হয়ে উঠেছে এখন।

দারিদ্র্য ও পিআরএসপি নিয়ে অর্থমন্ত্রীর কথামালা

● আমি আইপিআরএসপির পুরো রিপোর্ট পড়ে দেখিনি। মূলত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বিভিন্ন সময়ে যা বলেছে তাই এখনও বলছে। প্রায় ৪০টির মতো দেশ কৌশলপত্র তৈরি করছে। আমাদেরও তাদের পথে যেতে হবে। তা না হলে সমর্থন পাবো না। তবে দাতারা বলেছে বলেই কৌশলপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে তা নয়। দারিদ্র্য বিমোচন আমাদেরও লক্ষ্য। (৭ আগস্ট, বিআইডিএস, ঢাকা)

● আমরা তিন বছরের জন্য একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরি করছি। এটি কেবল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কোনো কৌশলপত্র নয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, অবকাঠামো উন্নয়ন সবকিছুই এর আওতায় থাকবে।...সারা বিশ্বেই দারিদ্র্য বিমোচন আন্দোলন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। দাতা সংস্থাগুলো এ শব্দসমূহ বেশি বেশি ব্যবহার করছে। আসলে বিশ্বব্যাংকের আগের কর্মসূচিগুলো থেকে এর খুব একটা পার্থক্য নেই।...রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে কেবল কাগজ তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না। (১২ ফেব্রুয়ারি, শেরাটন পিআরএসপি আন্তর্জাতিক সেমিনার, ঢাকা)

● দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আইনশৃঙ্খলার উন্নতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য দূর করতে হবে সব দিক থেকেই।.... বিশ্বব্যাংক বলে, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আগে কঠিন কাজগুলো সেরে নেওয়া দরকার। আমরা যদি দারিদ্র্য দূর করতে সঠিক কৌশল নির্ধারণ করতে পারি তাহলে আর বিশ্বব্যাংকের দরকার হবে না। (১৬ জানুয়ারি, ঢাকা)

● দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য পেতে আমরা দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলপত্র তৈরি করেছি। প্যারিস বৈঠকে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। ... আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানুষকে সুখী করা। তার জন্য প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। আমরা এমন প্রবৃদ্ধি চাই যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রবৃদ্ধি হলো অথচ সব টাকা সাইফুর রহমানের পকেটে গেল এমন প্রবৃদ্ধি দিয়ে লাভ নেই। (২ মার্চ ঢাকা)

● দাতারা এখন সহায়তার শর্ত হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র চায়। নামে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র হলেও এতে সুশাসন, আর্থিক সংস্কার, দুর্নীতি বন্ধ থেকে সবকিছুই আছে। ভাবটা এমন যেন তারা সহায়তার শর্ত হিসেবে দারিদ্র্যের উন্নয়ন যুক্ত করে দিয়েছেন। এটা না হলে দরিদ্র লোকজন ভাববে সাইফুর রহমান তাদের গরিবী থেকে মুক্তি দিতে চান না। (১৫ জানুয়ারি ২০০২ ঢাকা)

● সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিন বছর মেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদি যে বিনিয়োগ কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেটাই হবে দেশের সব উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি এবং এই পরিকল্পনাকেই পরবর্তীকালে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে রূপান্তর করা হবে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৪৩% বরাদ্দ রাখা হয়েছে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য। (বাজেট বক্তৃতা)

পিআরএসপি ও বাংলাদেশ

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও আইএমএফ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ব্যাপকভাবে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশসমূহের (এইচআইপিসি) জন্য ঋণ মওকুফ সুবিধা ও সহজ শর্তে ঋণদানের বিষয়টি নির্ভর করবে ঐসব দেশের জাতীয়ভিত্তিক নিজস্ব দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের ওপর। কমপ্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের (সিডিএফ) নীতিমালার আওতায় দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলগত (পিআরএসপি) সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে তৈরি করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বোর্ডে পেশ করার কথাও বলা হয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য এটা স্বীকার করে নেয় যে, অনেক দেশই এই মুহূর্তে একটি পরিপূর্ণ পিআরএসপি দ্রুততার সঙ্গে তৈরি করতে পারবে না। আর তাই ঋণ মওকুফ ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দ্রুততর করার জন্য বা আইএমএফের সাহায্য প্রাপ্তিতে যাতে বিলম্ব না হয় সেজন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলগত (আইপিআরএসপি) প্রস্তুত করার পরামর্শ দেয়া হয়। আইপিআরএসপিতে দেশের দারিদ্র্যের বর্তমান চিত্র, দারিদ্র্য নিরসনের বিদ্যমান কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ

‘পিআরএসপি একটি অর্থহীন দলিল হবে, এখান থেকে পাওয়ার কিছু নেই’

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের জন্য পিআরএসপিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ : যে পিআরএসপি নিয়ে এতো কথা বলা হচ্ছে সেটা তো আসলে পুরনো জিনিস। বিভিন্ন সময়ে দাতাগোষ্ঠী তাদের বচন ও বক্তৃতার ঢঙ বদল করে পুরনো একটি বিষয়কে নতুন নামে উপস্থাপন করতে চায়। পিআরএসপির বিষয়টিও সেরকম একটি ব্যাপার। সুতরাং এখান থেকে নতুন কিছু পাওয়ার আশা নেই।

বলা হচ্ছে খসড়া আইপিআরএসপিটি অনেকগুলো কনসালটেশনের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এটি চূড়ান্ত করার আগেও একাধিক কনসালটেশন হয়েছে যার মাধ্যমে জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

প্রথম কথা হলো কনসালটেশনটা আসলে কাদের সঙ্গে হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে সেটা দেখতে হবে। আমাদের মতো এলিটদের নিয়ে কনসালটেশন করলে সেটা তো পরিপূর্ণ কিছু হলো না। এতে ব্যাপকভিত্তিতে সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, তাদের মতামত তো পাওয়া গেল না। দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কৌশলপত্র করা হচ্ছে। তাহলে দরিদ্র লোকজনের কাছে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাদের কথা শুনতে ও বুঝতে হবে। অথচ যাদের জন্য কৌশলপত্র করা হচ্ছে তারা কৌশলপত্রের ভাষাই বোঝে না। তাহলে এটাকে অর্থহীন না বলে উপায় কি? আর কনসালটেশন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে দারিদ্র্যের কারণটা জানা। কিভাবে তারা দারিদ্র্যচক্রে আটকে রয়েছে তা ঠিকভাবে জানতে না পারলে এই চক্র থেকে তাদের বের করে আনা যাবে না। এগুলো না জেনেই দারিদ্র্য কমানোর জন্য কিছু কৌশল ঠিক করে ফেলা হলে দেখা যাবে তা বাস্তবে কাজে আসছে না।

২০০০ : অভিযোগ উঠেছে পিআরএসপি আসলে দাতা নির্দেশিত একটি দলিল হচ্ছে। ব্যাপারটা কি তাই?

মোজাফফর আহমদ : পিআরএসপি দলিল দেখলে সেটা মনে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কারণ এই যে আইপিআরএসপি দলিল সেটা লেখা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের কিছু ছকের মধ্যে থেকে। ছকের বাইরে খুব একটা কিছু নেই। ভাষাও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো। আসলে

পিআরএসপি প্রণয়নের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। এই আইপিআরএসপির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের সময়সীমাও নির্দিষ্ট করার পরামর্শ দেয়া হয়। বাংলাদেশও এই নির্দেশনা করে আইপিআরএসপির খসড়া প্রস্তুত করেছে। ২০০২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১০টি দেশ পিআরএসপি এবং ৪২টি দেশ আইপিআরএসপি প্রণয়ন করেছে।

পিআরএসপি ও বাংলাদেশ

দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশও একটি পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। প্রথমাবস্থায় দাতা বা উন্নয়ন অংশীদাররা এই কাজে অর্থায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং জড়িত হওয়ার কথাও বলে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) দাতাদের পক্ষ থেকে তহবিল যোগানের বিষয়টি সমন্বয়ের দায়িত্ব পায়। কিন্তু দাতাগোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যে মিল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই কাজে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

২০০০ সালের ১৬ নবেম্বর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার সভাপতিত্বে পিআরএসপির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে পিআরএসপি প্রণয়নের বিষয়টি দেখভাল করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিবকে প্রধান করে প্রধান মন্ত্রণালয়সমূহ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ১১ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, অর্থ বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবগণ। স্পষ্টতই একটি আমলানির্ভর টাস্কফোর্স গঠন করে পুরো প্রক্রিয়াকে একটি আমলাতান্ত্রিক দিকে ঠেলে দেয়ার উদ্যোগটি এভাবে পিআরএসপি প্রণয়নের শুরুতেই করা হয়। দাতাদের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাপকভিত্তিক কনসালটেশনের জন্য পিআরএসপি সমন্বয়কারী (ইআরডি সচিব) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ১৫টি বৈঠক করে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টাস্কফোর্সের ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিআরএসপি ডকুমেন্ট তৈরির জন্য সরকার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) ২ জন ঊর্ধ্বতন গবেষককে কনসালটেন্ট নিয়োগ করে। এরা হলেন ড. এম.কে মুজেরি এবং ড. বিনায়ক সেন। এছাড়া

পুরো জিনিসটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়ায়। আর প্রথমেই বলেছি ডোনার রেটরিকসের কথা। এখানেও সে বিষয়টা প্রয়োজ্য।

২০০০ : অর্থমন্ত্রী বলেছেন তিনি ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা চান। তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কি বাদ দেয়া হবে বলে মনে করেন?

মোজাফফর আহমদ : বিভিন্ন সরকারের সময়ে যেসব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল সেগুলো কখনো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়নি। একটি দলিল করা দরকার তাই করা হয়েছে। কারণ সরকারের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা মূল দলিল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লেখার জন্য লেখা। তারপরও এটিকে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা কার্যক্রমের মূল দলিলে পরিণত করার সুযোগ ছিল ও আছে। ভারত সরকার কিন্তু পিআরএসপি প্রণয়নে বিশ্বব্যাংকের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে তাদের ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। অর্থমন্ত্রী যেহেতু দাতাদের চাপ এড়াতে পারছেন না, তাই বলেছেন তিন বছরের পরিকল্পনার কথা। আসলে পিআরএসপি তো ৩ বছর অন্তর পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা।

২০০০ : জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া কি কখনোই এরকম গুরুত্বপূর্ণ দলিলে থাকবে না?

মোজাফফর আহমদ : অতীত অভিজ্ঞতায় তাই দেখা গেছে, দাতাদের নির্দেশনা অনুসারে এখন পিআরএসপিকে একটি অংশগ্রহণমূলক দলিল করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় গিয়ে কিছু লোকজন জড়ো করে কয়েক ঘন্টা কথা বললেই তো সেটা অংশগ্রহণমূলক হয়ে গেল না। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে। কাজেই আলাদা আলাদাভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আর ফরিদপুরের পল্লী অঞ্চলে একই ধরনের সমস্যা নেই। যেমন আমরা ঢালাওভাবে বলছি সবার জন্য শিক্ষা। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সম্প্রসারণ করতে হলে গণহারে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে তো চলবে না। আলাদা সমস্যাগুলো আলাদাভাবে নির্ধারণ ও সমাধান নির্ণয় করতে হবে। ডিটেল প্ল্যানিংয়ে যেতে হবে। তারপর একটি সমন্বিত ব্যাপক কর্মকাঠামো দাঁড় করাতে হবে।

২০০০ : পিআরএসপিতে অগ্রাধিকারমূলক কোন বিষয়গুলো আসা উচিত বলে মনে করেন?

মোজাফফর আহমদ : আমাদের দেশে এখন সবচে' বড় সংকট হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও ব্যাপক দুর্নীতি। এ দুটো দিকে নজর না দিলে এগুলোর উন্নতি না করা পর্যন্ত আমাদের উন্নয়ন হবে না, আমাদের দারিদ্র্য কমবে না। অথচ এদিকে সরকারের যেমন নজর নেই, তেমনি নেই অন্যদেরও। পিআরএসপিতে এ দুটো বিষয় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। অথচ দাতারাও বারবার এ দুটো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

২০০০ : তাহলে পিআরএসপি থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত কিছুই পাব না?

মোজাফফর আহমদ : একটি দলিল ঠিকই হবে, কিন্তু এর বাস্তবায়ন হবে বলে মনে হয় না। যা হবে তা হলো প্রকল্পের নামে লুটপাট ও অপচয়। আমাদের ধনী-দরিদ্রের যে ব্যাপক বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে, ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। দারিদ্র্য কমানোর জন্য বেকারত্ব হ্রাস বা কর্মসংস্থান তৈরি করা প্রয়োজন। সেদিকে কোনো নজর নেই। দাতারাও সেদিকে না তাকিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য উদারীকরণ ইত্যাদি কিছু বিষয়ে অধিক আগ্রহী। ফলে একটি অর্থহীন দলিল হাতে নিয়ে আমাদের চলতে হবে।

‘দারিদ্র্যসীমা কমাতে না পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা আসবে না’

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাণিজ্যমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র আমাদের জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ হবে বলে আপনি মনে করেন?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী : দারিদ্র্য বিমোচন করা আমাদের সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দারিদ্র্য কমাতে না পারলে আমরা সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন ঘটাতে পারব না। দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বায়নের এই যুগে তাল মিলিয়ে চলা খুব কঠিন হবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটা জরুরি। আর এটি অংশীদারিত্বমূলক ও জনসাধারণের মতামতের আলোকে করা হচ্ছে যা দীর্ঘমেয়াদের জন্য কার্যকর করা হবে।

২০০০ : বিশ্ববাণিজ্যে আমাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি? থাকলে সেটা কিভাবে?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী : দেশের দারিদ্র্য সীমা কমাতে না পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা আনা যাবে না। সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্যতা কমানো। এ দিক বিবেচনায় অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রয়োজন। সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা আনতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ, পিআরএসপি দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি হলেও এতে আসলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকছে। যে কারণে ছোট-বড় নানা ধরনের শিল্প-ব্যবসা গড়ে উঠবে। এর ফলে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা আসবে। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে।

২০০০ : তাহলে আইপিআরএসপির আলোকে আপনারা কোন ধরনের বাণিজ্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা ভাবছেন?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী : দেশের সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজন হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ। বিশেষত কৃষি ভিত্তিক শিল্পের ওপর নির্ভর করেই দেশ এগিয়ে যেতে পারে। আসলে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য বিশেষত রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কৃষি ও হালকা প্রকৌশল শিল্পের ওপর। আমরা সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আরেকটি জিনিস বলা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের বাজারে পণ্য রপ্তানি বাড়ানো এবং নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য আরো অনেক কিছুর সঙ্গে প্রয়োজন পণ্যের মান উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, স্বাস্থ্যকরভাবে পণ্য উৎপাদনের পরিবেশে তৈরি এবং অন্য দেশের পণ্যের সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত মূল্য নির্ধারণ। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা এগুলো সম্ভব করতে পারব। মনে রাখতে হবে, বৈদেশিক সাহায্য আর আগের মতো পাওয়া যাবে না। যে কারণে আমরাও বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সিলার নিয়োগ দিচ্ছি, যাতে ওই সব দেশে পণ্য প্রবেশে নানা ধরনের সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে তৎপরতা চালানো যায়।

বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য স্বল্প মেয়াদে ১১ জন কনসালটেন্টও নিয়োগ দেয়া হয়।

বস্তুত, পিআরএসপি প্রণয়নের এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে ক্রমেই আপত্তি ওঠে এবং খসড়া আইপিআরএসপি তৈরির পর পুরো প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

কনসালটেশন ও প্রণয়ন : অস্বচ্ছ

পিআরএসপি প্রণয়ন করার জন্য দাতাদের শর্তানুসারে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে আমাদের বিভিন্ন অধিকারভোগীদের সঙ্গে কনসালটেশন বা আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দু’টি পর্যায়ে এই কনসালটেশন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং তদনুসারেই অন্তত বাহ্যিকভাবে এসব কনসালটেশন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কলসালটেশনটি সম্পন্ন হয় আইপিআরএসপির খসড়া প্রস্তুত করার আগে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এসব কনসালটেশনের ভিত্তিতেই খসড়া আইপিআরএসপি প্রণীত। আর এই খসড়ার ওপর দ্বিতীয় দফা বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কনসালটেশন করে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই

‘বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনকে সমর্থন দেয়া’

ফ্রেডরিক টি টেম্পল

কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই হলো দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে সমর্থন দেয়া। বস্তুত বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গেলে অন্য কোনো বিষয়ের চেয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রেক্ষিতেই তা ভাবতে হবে।

বিশ্বব্যাংক মনে করে, দারিদ্র্য কমানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। ’৯০-র দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ১ হাজার কোটি ডলারে জিডিপি যুক্ত হয়েছে যা কিনা প্রকৃতপক্ষে ৬০% বৃদ্ধি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড়ে ৫% এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসায় এটি মাথাপিছু ৩% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ৯০-র দশকে দারিদ্র্য কমেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টে গোল অনুসারে বাংলাদেশকেও দারিদ্র্যের হার ’৯০-র অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আর বাংলাদেশ যদি এটি করতে চায় তাহলে বার্ষিক ৭% হারে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। আর এটি যদি দারিদ্র্য-মুখী (প্রো-পুওর) করা যায় তাহলে প্রবৃদ্ধি থেকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

খসড়াটি চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কনসালটেশনও শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম পর্যায়ের কনসালটেশন প্রক্রিয়ায় দেশ জুড়ে মোট ২২টি কনসালটেশন করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এসব কনসালটেশনের প্রায় সবগুলোই এ বছর জানুয়ারি মাসে করা হয়েছে। আর এসব কনসালটেশনের ব্যবস্থপনার দায়িত্ব পালন করে দেশের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাক। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট– এই ৫টি বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় পর্যায়ের কনসালটেশনগুলো করা হয়। আবার ঢাকার সাভার, বরিশাল সদর, খুলনার রূপসা, রাজশাহী সদর (উত্তর), চট্টগ্রামের মিরসরাই এবং সিলেট সদর উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ের ১২টি কনসালটেশন করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় দু'টি করে কনসালটেশন করা হয়েছে। মজার বিষয় হলো, প্রতিটি উপজেলায় একই দিনে

আইপিআরএসপি থেকে পিআরএসপি বাংলাদেশ

- খসড়া আইপিআরএসপি প্রকাশ- জুন ২০০২
- খসড়া চূড়ান্তকরণ- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২
- সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে পরামর্শ ও কৌশল কাঠামোয় তার সমন্বয়- ডিসেম্বর ২০০২
- বিভিন্ন লক্ষ্য, কর্মসূচি, প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়নের বিস্তারিত নিষ্পন্নকরণ- মার্চ ২০০৩
- দারিদ্র্য মূল বিষয়াদি (প্রোভার্টি ফোকাল পয়েন্ট) ও নাগরিক উদ্যোগ চালু- মার্চ ২০০৩
- পূর্ণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি) চূড়ান্তকরণ- মার্চ ২০০৪

'নাগরিক সমাজ একটি বিকল্প পিআরএসপি দিতে পারে'

ড. আতিউর রহমান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করার মূলে ছিলো দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফ করার বিষয়টি। আফ্রিকার দেশগুলো যখন ঋণ মওকুফের আবেদন জানাল এবং তাদের ঋণ মওকুফের বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ চিন্তা-ভাবনা শুরু করল তখন অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলোও তাদের ঋণ মওকুফ চাইল। এরকম একটা প্রেক্ষিতে পিআরএসপি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশকেও একটি পিআরএসপি তৈরি করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে খসড়া আইপিআরএসপি তৈরিও হয়ে গেছে। সরকারের উচিত সত্যিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি করতে হলে আগে পরিপূর্ণ আইপিআরএসপি তৈরি করা।

আমি জাতীয়ভিত্তিক দলিলের কথা বলছি এজন্য যে এই পিআরএসপি দলিলের ওপর আমাদের দেশের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। আর একবার এটা হয়ে গেলে দাতাগোষ্ঠী সবকিছুতেই পিআরএসপির রেফারেন্স টানবে আর বলবে যে, যা করার এটার আলোকে করতে হবে। এমনকি দ্বিপাক্ষিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রেও পিআরএসপি প্রাধান্য পাবে। জাতীয়ভিত্তিক দলিল করার জন্য আইপিআরএসপি নিয়ে জাতীয় সংসদে বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের মত বিনিময়। সংসদের বাইরে সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন অধিকারভোগীদের সঙ্গে মত বিনিময়, আলোচনা ও বিতর্ক হতে হবে। সর্বোপরি জাতীয় সংসদে পাস করার মাধ্যমে আমাদের পিআরএসপি চূড়ান্ত করতে হবে।

বাস্তবতা হলো এখন পর্যন্ত পিআরএসপির বিষয়টি একটি আমলাতান্ত্রিক উদ্যোগ রয়ে গেছে। আর তাই এই যে খসড়া আইপিআরএসপি সেটা কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হলো সে সম্পর্কে সঠিক স্বচ্ছভাবে কেউ কিছু জানে না। অধিকারভোগী বিশ্লেষণ হয়েছে কি না তাও জানি না। যেসব কনসালটেশন হয়েছে সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করে মূল দলিলের সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। অথচ তাও হয়নি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল তৈরি হচ্ছে কিন্তু এতে কি অগ্রাধিকার পাবে বা পাচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। পিআরএসপি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা নাগরিক সমাজ তারা কি একটি বিকল্প পিআরএসপি দিয়েছি? বা বিকল্প কি হতে পারে সেরকম কিছু উপস্থাপন করেছি? আমরা কোনো উদাহরণ না দিয়ে শুধু সমালোচনা করলে তাও ফলপ্রসূ কিছু হবে না।

'দ্রুতহারে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন উচ্চহারের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন'

ম্যারন ভ্যারোভেন
বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ)-এর আবাসিক প্রতিনিধি

৯০-র দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে এই দশকে গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫% হারে অর্জিত হওয়ায়। প্রবৃদ্ধির হার ৬% থেকে ৬.৫%-এ উন্নীত করা গেলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের আগেই চরম দারিদ্র্য সীমা অনেক কমিয়ে আনতে পারবে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) নির্ধারিত কার্যকর হারে বা ৮৮৫ ডলারে উন্নীত করতে হলে আগামী ২৫ বছরে গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতে হবে ৬% থেকে ৬.৫%। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। আর তা সম্ভব হবে স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতির পরিবেশে দ্রুত কাঠামোগত সংস্কার, উন্নত শাসন ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে। যদি এই ধারায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সহজ হবে।

২০০০-২০০১ সালে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৩৪% ছিল চরমভাবে দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নিচে যে হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৪৩%। আর মোট জনগোষ্ঠীর ৫০% দরিদ্র যে হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৫৯%। পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও এটি এখনও নগর দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি। এসব অর্জন সত্ত্বেও দরিদ্র জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন ও ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান যার মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৬৬ ডলার। বস্তুত, দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বাংলাদেশকে এখনও অনেক কিছু করতে হবে।

পিএসআরপি কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা

বলিভিয়া : বলিভিয়ায় আইএমএফ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির ব্যাপারে নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সরকার নাগরিক সংগঠনগুলোকে শেষ মুহূর্তে আলোচনার জন্য ডাকে, তবে যেসব আগ্রহী সংগঠন তাতে যোগ দিতে চেয়েছিল তাদেরকে ডাকা হয়নি।

তাঞ্জানিয়া : ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে তাঞ্জানিয়ার কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন সরকারের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি চিঠি পায়। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল পিআরএসপি এবং এই পিআরএসপিতে বেসরকারি সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করানোর ব্যাপারে সরকারের আগ্রহ। নাগরিক সংগঠনগুলোকে জাতীয় পর্যায়ের আলোচনার নামে মাত্র অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় কিন্তু কৌশলপত্র তৈরির সর্বশেষ খসড়ার সময় নাগরিক সংগঠনগুলোকে এই প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়।

মোজাম্বিক : মোজাম্বিকের আইপিআরএসপি'র খসড়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম আলোচনা করা হয়নি। ২০০০ সালের এপ্রিলে অনুমোদিত এই খসড়ার ব্যাপারে সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য হলো– এর জন্য আলোচনার দরকার নেই। দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কৌশলের ব্যাপারে ১৯৯৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০০০ সালের এপ্রিলের মধ্যে কোনো রকম আলোচনা হয়নি।

নেপাল : নেপালের ক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি দেশের মতো সংশ্লিষ্টদেরকে বেশি আগে জানানো হয়নি। নেপালে মাত্র ২৪ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্টদেরকে জানানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিনিধিরা কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই তাতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে তাদের চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। অ্যাকশন এইড নেপাল সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পিআরএস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

কেনিয়া : কেনিয়াতে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু আমলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এরা হয় বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তা অথবা সরকারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক থেকে বেতন পাচ্ছে। বিভিন্ন রকম মতবিনিময় সভা/নাগরিক সভায় অভিযোগ করা হয় যে, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কিছু পরিবর্তনের জন্য সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে।

কম্বোডিয়া : কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আলোচনার এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষের কোনো প্রতিনিধি নেই। কম্বোডিয়ার আইপিআরএসপি সম্পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা স্থানীয় 'খেমার' ভাষায় অনূদিত হয়নি। ফলে স্থানীয় সংগঠন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অনেকেই তাদের মতামত দিতে পারেননি। প্রস্তুতকৃত আইপিআরএসপিতে 'টেকনিক্যাল' ভাষার ব্যবহার বেশি থাকার কারণে স্থানীয়দের অনেকেই ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি কর্মকর্তারাও ঠিকমত বুঝতে পারেননি। ফলে তারা কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারেননি।

দু'টি করে কনসালটেশন করা হয়েছে। সকালবেলা দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আর বিকেলবেলা নাগরিক সমাজের সঙ্গে– এ দু'ভাগে কনসালটেশন হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের কনসালটেশনে ৫০/৬০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর গড়ে ৪০/৪৫ জন অংশগ্রহণ করে। উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কনসালটেশনে নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিক, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কনসালটেশনে অংশ নেন। কোনো কোনো কনসালটেশনে স্থানীয় সাংসদ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দও অংশ নেন। তবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সাংসদদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক ও আলোচনা করা হয়নি। ব্যবসায়ী সমাজকেও সেভাবে ডাকা হয়নি।

স্থানীয় পর্যায়ের বাইরে জাতীয় পর্যায়ে দু'টি কনসালটেশন করা হয়। একটি হয় সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে, অপরটি এনজিও ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে। এছাড়া দাতাদের সঙ্গে পৃথক আরেকটি কনসালটেশন বা বৈঠক করা হয়। বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কনসালটেশনে অংশ

পিআরএসপি জরিপ : ৩০৭১ জন

পিআরএসপি বিষয়ে জনসাধারণের ধারণা জানার জন্য আমরা একটি জরিপ পরিচালনা করেছিলাম। জরিপে মোট ৩ হাজার ৭১ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেছে। একটি নমুনাভিত্তিক জরিপ হিসেবে এই সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও এতে যে ফলাফল উঠে এসেছে তাতে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মতামত ভাবনারই একটি প্রতিফলন বলে আমরা মনে করি।

জরিপ ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ পিআরএসপির বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানেন না। বরং তারা এটা মনে করেন যে সরকার এটিকে একটি রাজনৈতিক চাল বা কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে, যেমনটি করেছে অতীতের সরকারগুলো। জরিপের সবচে' আশঙ্কাজনক দিক হলো জনসাধারণের মনে এই ধারণাটি বেশ প্রবল যে সরকার আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে আন্তরিক নয়। একটি নির্বাচিত এবং ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত সরকারের প্রতি জনমনে এমন ধারণা আর যাই হোক কোনো সুখকর বিষয় নয়। তুলনামূলকভাবে লোকজনের মধ্যে এরকম একটি ধারণা এখনও রয়েছে যে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ নিলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমবে যদিও বেশিরভাগ লোকই এই ধারণাটি সমর্থন করেননি।

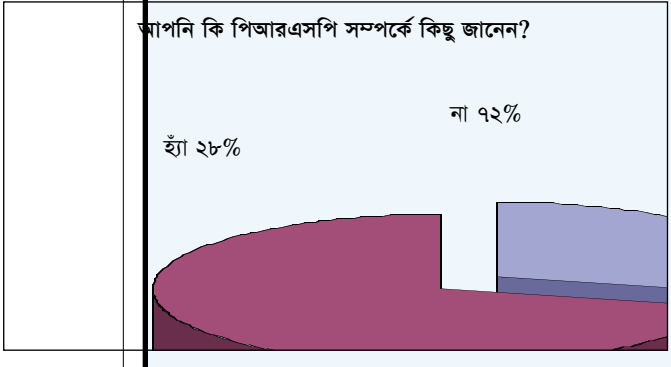

পিআরএসপি সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক কোনো প্রচারণা চালানো হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে কিছু বলেনি বা কোনো কর্মসূচি নেয়নি। ফলে এটি সম্পর্কে জনসাধারণে জানার বা অন্তত তাদের কানে বিষয়টি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে কম। যেটুকু হয়েছে সেটুকু কিছু

নেয়ার জন্য ৭৫-৮০ জন লোককে আমন্ত্রণ করা হয়, যেখানে গড়ে হাজির হয়েছিল ৫০/৫৫ জন।

কনসালটেশন করার এরকম ধরন দেখেই বোঝা যায় যে, কত তড়িঘড়ি করে এটি সম্পন্ন করা হয়েছে, যেন দায়সারা গোছের। স্থানীয় পর্যায়ে কনসালটেশনে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এমন কথাও জানা গেছে যে, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে সকালবেলা মিটিং করার জন্য ডেকে আনা হয়েছে। আবার মিটিং শেষ করে মিটিংয়ের রিপোর্ট বা সারসংক্ষেপ না নিয়েই পিআরএসপি টিম ঢাকায় চলে গেছে। পরবর্তীতে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত ঐসব রিপোর্টের পরিণতি কি হয়েছে তা অনেকটাই অজ্ঞাত। আবার কনসালটেশনের জন্য সেভাবে লিখিত কোনো কাগজপত্র দেয়া হয়নি। ফলে হঠাৎ করে হাজির হওয়া অংশগ্রহণকারীরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে, তাদেরকে আসলে কেন ডাকা হলো আর সরকার তাদের কাছে ঠিক কি জানতে চায়। কনসালটেশন প্রক্রিয়ায় এহেন গলদ থেকেই বোঝা যায় যে, খসড়া আইপিআরএসপি দলিলে এসব কনসালটেশনের তেমন কিছুই উঠে আসেনি। তবে দায়সারা গোছের হলেও যেটুকু আলোচনা বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটাকে উপেক্ষা করার কিছুই নেই। অথচ খসড়া আইপিআরএসপিতে সেটাও করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে

- মানব দারিদ্র্য সূচকে ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম
- দেশের মোট আয়ের মাত্র ৩.৯% পায় সবচে' গরিব ১০% লোক।
- সবচে' ধনী ১০% লোক নিয়ে যায় মোট আয়ের ২৮.৬%।
- সবচে' ধনী ২০% লোক মোট আয়ের ৪৪.৮% ভোগ করে।
- সবচে' গরিব ২০% লোক পাচ্ছে মোট আয়ের মাত্র ৮.৭%।
- সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে জিডিপির মাত্র ১.৭% ব্যয় করে।
- জিডিপির মাত্র ২.২% ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে।
- মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩% এখন অপুষ্টির শিকার।

সূত্র : ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০০

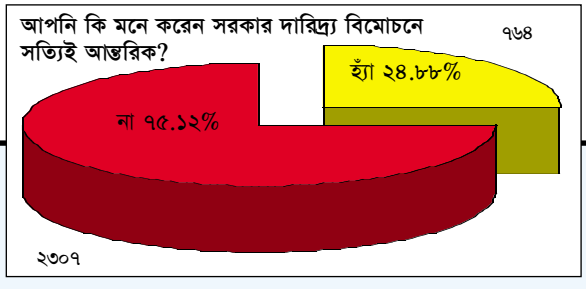

এসেছে সেটিকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের জরিপ হতে পারে যা একটি ব্যাপকভিত্তিক জনমতেরই এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার কারণে। মিডিয়াতেও সত্যিকার অর্থে এটি নিয়ে খুব ব্যাপকভিত্তিক কিছু হয়নি। আমাদের জরিপে সে বিষয়টি পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে।

আর পিআরএসপিকে একটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে দেখা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের আন্তরিকতায় ব্যাপক সন্দেহ প্রকাশ রাজনীতিবিদ ও সরকারের প্রতি জনসাধারণের দুর্বল আস্থার প্রকাশ বলেই মনে করা যেতে পারে।

আমাদের এই জরিপটি খুব ব্যাপকভিত্তিক না হলেও এর ভেতর থেকে যে ইঙ্গিত বেরিয়ে

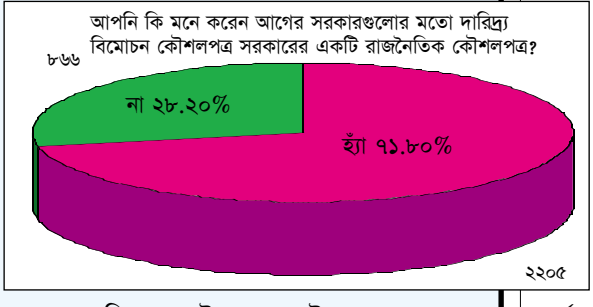

প্রতিফলন ঘটাবে । সেই সঙ্গে সরকারসহ নীতিনির্ধারকদের ওপর একটি চাপও তৈরি করা সম্ভব হবে।

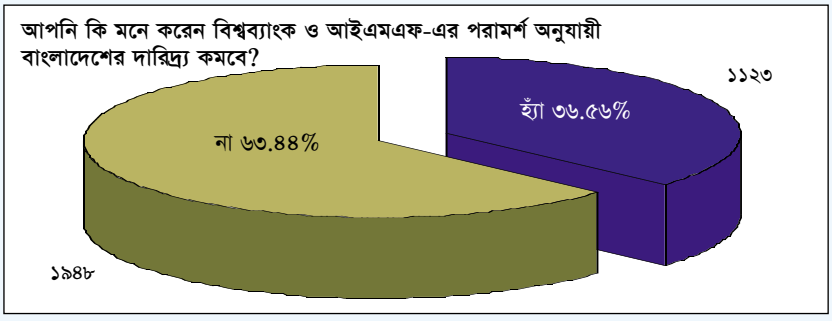

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যৌথভাবে ফেব্রুয়ারির ১২-১৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় পিআরএসপি বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে পিআরএসপি প্রক্রিয়ার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ, নীতি ও উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে পিআরএসপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতা ও শিল্পগুলোর কিছু দিক উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে পিআরএসপি দলিল প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ সরকার ও সরকারের বাইরের লোকজন এবং বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। মজার বিষয় হলো, এই আন্তর্জাতিক সেমিনারেও বাংলাদেশের পিআরএসপি সংক্রান্ত কোনো দলিল বা কাগজপত্র দেয়া হয়নি। ফলে সেমিনারের আলোচনা কার্যক্রম বাংলাদেশের পিআরএসপির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর দিকে না গিয়ে এটির কর্মকাঠামোর দিকে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কনসালটেশন শুরু হয় জাতীয় সংসদে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করার পর। এটি শুরু করার সঙ্গে বিভিন্ন মহলে খসড়া আইপিআরএসপি পাঠানো হয়। সময়সীমা অনুসারে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই খসড়াটি প্রস্তুত করার কথা থাকলেও কার্যত প্রস্তুত করতে মে মাস গড়িয়ে যায়। ফলে জুন মাসের আগে এটি হাতে পাওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ খসড়া দলিলে সময় লেখা রয়েছে এপ্রিল মাস। অবশ্য পূর্ব-নির্ধারিত সময়সীমা থেকে পিছিয়ে আসা এটাই বোঝায় যে, তাড়াহুড়ো করেও বেশি দ্রুত কাজটি করা যায়নি। সে কারণেই খসড়াটি চূড়ান্ত করার সময়সীমা বছরের মাঝামাঝি থেকে সরিয়ে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে নিয়ে আসতে হয়েছে।